**লিসবন সিটি ট্যুর**

[](https://www.jugantor.com/assets/news_photos/2021/09/25/image-468980-1632519005.jpg)

বলা হয়ে থাকে গ্রিসের এথেন্স ও ইতালির রোমের পর বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীন শহর হলো লিসবন। কিংবদন্তি প্রাচীন গ্রিক নায়ক ইউলিসিস লিসবন নগরীর গোড়াপত্তন করেন। সেই গল্প না হয় আরেক দিন হবে। সাগর, পাহাড়, নদীবেষ্টিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু বিশ্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির স্থান। পুরনোর সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনের এক অপরূপ সৌন্দর্যের নাম লিসবন শহর। আজ এ প্রাচীন শহরেই আমাদের একটা সিটি ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে। দুই দিন হলো লিসবন এসেছি। হেঁটে হেঁটে বেশ কিছু অংশ ঘোরা হলেও লিসবনের মুখ্য আকর্ষণগুলো এখনো দেখা বাকি।

আমরা বাংলাদেশ থেকে ২০ জনের একটা দল নিয়ে লিসবনে এসেছি একটা কনফারেন্সে যোগদান করতে। আজ কনফারেন্সে আমাদের যেহেতু কোনো সেশন নেই, তাই আজকের দিনটাকেই সিটি ট্যুরের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। বেশ সকালেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। বেশ আয়েশ করেই কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের লবিতে নামতেই পরিচিত হলাম আমাদের আজকের ট্যুর গাইড প্যাট্রিসিয়ার সাথে। মধ্য ত্রিশের বেশ আকর্ষণীয়া মহিলা। দুই বাচ্চার মা হলেও যৌবন এখনো অটুট। বেশ ভালো ইংরেজি বলতে পারেন। আর সবচেয়ে যে জিনিসটা ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে একটু সময় নিয়ে গুছিয়ে কথা বলেন, যার দরুন আমাদের মতো ইংরেজিতে কাঁচা লোকদেরও বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। প্যাট্রিসিয়ার কাছ থেকেই জেনে নিচ্ছিলাম আমাদের আজকের গন্তব্য সম্পর্কে। আজকে মূলত আমরা লিসবন শহর আর এর শহরতলীর কিছু মুখ্য গন্তব্যে ঘুরে বেড়াব। আমাদের হোটেলটা মানে বোর্জেস চিয়াদো হোটেল নিজেও একটা হেরিটেজ প্লেস আর চিয়াদো নামক স্থানটাও একটা অন্যতম ট্যুরিস্ট ডেসটিনেশন। এখান থেকে বের হয়ে সান্তা বান্তা এলিভেটর হয়ে রসিও স্কোয়ার। সেখান থেকে আমরা সোজা চলে যাব বেলেম এলাকায়; যেটা আসলে একটা শহরতলী।

বেলেমে আমরা ঘুরে দেখবো বেলেম টাওয়ার, ডিসকভারি মনুমেন্ট, এপ্রিল ২৬ ব্রিজ আর জেরোনিমোস মন্সট্রারি আর সেই সাথে চেখে দেখবো লিসবনের বিখ্যাত পেস্ট্রি নাতা। সেখান থেকে লিসবন কলোসিয়াম, স্পোর্টিং লিসবনের খেলার মাঠ দেখে মিরাদুরো পার্কা এদুয়ার্দো সেভেন হয়ে আবার হোটেলের পথে। ফেরার পথে কেউ চাইলে শপিংয়ের জন্য থামতে পারে অথবা রসিওতে এসে শেষ হবে সিটি ট্যুর। রাতের খাবার খেতে হবে কোনো রেস্তোরাঁয়।

ট্যুরের শুরুতেই প্যাট্রিসিয়া আমাদের লিসবন সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছিলেন, অধিকাংশ তথ্যই গত দিনের অনলাইন তথ্যের সাথে অনেকটাই মিলে গেল, যার দরুন আমিও বেশ সঙ্গত করতে পারছিলাম। যার দরুন প্যাট্রিসিয়ারবলার উৎসাহও দেখলাম দ্বিগুণ বেড়ে গেল। উৎসাহী স্রোতা পেলে কার না এমন হয়। আর সুন্দরী গাইডের সুললিত বাণী আমাকেই বা প্রলুব্ধ না করে ছাড়ে কীভাবে। তো আড্ডাটা ভালোই জমে উঠলো। পর্তুগালের রাজধানী শহর ও বৃহত্তম নগরী লিসবন; যা আটলান্টিক মহাসাগর ও টাগুস নদীর র্তীরে অবস্থিত। বৃহৎ সাতটি পাহাড় নিয়ে গঠিত টাগুস নদীপারের মনোরম এক শহর। তাই এই শহর অনেকের কাছে সেভেন হিল সিটি নামেও পরিচিত।

রসিও থেকে বাসে চড়ার পূর্বেই আমাদের সামনে পড়লো সিটি সেন্টারে Elevador de Santa Justa : An Antique Elevator। গত দুই দিনই বেশ কয়েকবার এখান দিয়েই আসা যাওয়া করেছি, স্ট্রাকচারটি দেখেছিও কিন্তু থামা হয়নি। এটি একটি একক লিফট; যার নকশা করেছেন আইফেল টাওয়ারের নকশাবিদ। তবে বলা হয়ে থাকে গুস্তাভ আইফেল নিজে সরাসরি এই এলিভেটর নির্মান করেননি, বরঞ্চ তার ছাত্ররা এই লিফট নির্মাণ করেন আর তিনি তত্ত্বাবধান করেন। এর কাঠামোর সাথে আইফেল টাওয়ারের কাঠামোর কিছুটা মিল রয়েছে। এই লিফটটি পর্তুগালের লিসবন শহরের চিয়াদো এলাকার শান্তাযাস্টা নামক রাস্তার পাশেই নির্মিত তাই এই নাম। এটার কাজ শুরু হয় ১৯০০ সালে এবং শেষ হয় ১৯০২ সালে। প্রথমদিকে হেঁটেই এই লিফটের উপরে উঠতে হতো, বৈদ্যুতিক লাইনের সাহায্য উপরে উঠার জন্য এটিকে কনভার্ট করা হয় ১৯০৭ সালে। লোহা দ্বারা নির্মিত এই লিফটির উচ্চতা ৪৫ মিটার। এটা লিসবন শহরের পর্যটকদের একটি প্রিয় দর্শনীয় স্থান।

এই লিফট থেকে লিসবন পুরো ৩৬০ ডিগ্রি ভিউতে দেখা যায়। এর আরেক নাম কারমো লিফট। নিচের বাইশার সাথে উপরের কারমো স্কোয়ারের মিলন ঘটিয়েছে এই লিফট। এটিই লিসবনের একমাত্র রোড লিফট যা জনসাধারনের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত। আপনি বাইশা থেকে কারমো যেতে চাইলে, ট্যাক্সিতেও যেতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে ভাড়া গুনতে হবে কয়েকগুণ বেশি, সময়ও লাগবে অনেক। আর এই লিফটে চড়ে আপনি অনায়াসেই বাইশা থেকে কারমো উঠে যেতে পারেন মাত্র ৫ ইউরোয়, তবে আপনার কাছে ডে পাস থাকলে বিনামূল্যেই আপনি এ লিফটে চড়তে পারবেন। আমাদের যেহেতু একটু দূরের গন্তব্যে যেতে হবে তাই এ যাত্রা লিফটে না চড়ে রসিওর দিকে এগিয়ে চললাম। তবে কিছুদিন পরে আমার ঠিকই সুযোগ হয়েছিল এই লিফটে চড়ার, তাও বিনামূল্যে। সেই গল্পে পরে আসছি।

রসিওতে পৌঁছতে আমাদের দেরি হওয়ায় বাস আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আসলে রসিও এত ব্যস্ত একটা জায়গা যে, এখানে বেশিক্ষণ গাড়ি পার্ক করে রাখা যায় না। আর আমাদের এত বড় দল যে সবাইকে একসাথে করাও মুশকিল। দলনেতা সাইফুল ভাই বাসের ড্রাইভারের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করে জানালেন বাস আবার ঘুরে আসছে।

বাস আসার সুযোগে প্যাট্রিসিয়া আমাদের রসিও স্কোয়ারের আশপাশের মুখ্য স্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছিলেন। এই রসিও স্কয়ার ১৩শ-১৪শ শতকে লিসবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এটি লিসবনের গুরুত্বপূর্ণ স্কয়ারগুলোর একটি। এটাকে এক সময় ব্যবহার করা হয়েছে উৎসব, ষাঁড় লড়াই বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবার স্থান হিসেবে আর এখন এটা লিসবনবাসীর অন্যতম মিলনস্থল।

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ের মাথার উপর একটা ক্যাসেলের মতো, গতরাতেই আলফামা থেকে যেটা দেখে এসেছি, সেইন্ট জর্জ ক্যাসেল। এখন দিনের আলোতে নিচ থেকে দেখতে অন্যরকম লাগছে। কালকের দেখা সেই রহস্যময়তা কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছে।

আমাদের দলনেতা আরেকবার দলের সবাইকে একটু কড়া ভাষায়ই বুঝিয়ে দিলেন যে, আজকেই শেষ; এরপর এই ধরনের ঘটনা ঘটলে যারা উপস্থিত থাকবে তাদের নিয়ে বাকিদের ফেলেই বাস চলে যাবে। এরপর থেকে আমরা খুব সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরও দলে কুম্ভকর্ণের সংখ্যা নেহায়েতই কম ছিল না বিধায় অধিকাংশ দিনেই বাসের অনেক সিট ফাঁকাই থাকতো। দলের সবচেয়ে কনিষ্ঠ আর হাতে ডিএসএলআর থাকায় সবার কাছ থেকে একটু আলগা খাতিরই পেতাম। যার দরুন ছবি তোলার সুবিধার জন্য বাসের সামনের সিটই জুটতো বেশিরভাগ সময়। আমার পাশেই প্যাট্রিসিয়ার সিট, যেটাতে আবার একটা মাইক্রোফোনেরও ব্যবস্থা আছে। সেই মাইক্রোফোনের সাহায্যেই প্যাট্রিসিয়া আমাদের শোনাচ্ছিলেন লিসবনের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের কথা।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০০ বছর আগে প্রথম এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। তাই এই শহরে অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে। ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত ১৫টির বেশি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান রয়েছে পর্তুগালে। তাই প্রতি বছর প্রায় ১৮ মিলিয়ন মানুষ পর্তুগাল ভ্রমণ করে এবং এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ আসে এই নগরীর প্রাচীন সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এখানে অনেক ঐতিহাসিক এবং দর্শনীয় স্থান রয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর যেসব রাজধানী শহরে সী বীচ রয়েছে তাদের মধ্যে লিসবন অন্যতম। লিসবন সিটি সেন্টার থেকে মাত্র ২০ কি.মি. দূরে বীচের অবস্থান; যা মাত্র ১৫-২০ মিনিটে বাস, ট্রেন বা কারে আসা-যাওয়া করা যায়।

বাস ছুটে চলেছে তাগুস নদীর তীর ধরে। এত সুন্দর মনোরোম পরিবেশ! কেউ চাইলে জেরোনিমোস থেকে হেঁটেও পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখতে পারেন। বাস থেকে চোখে পড়লো বেলেম টাওয়ার। এটাও ১৬শ’ শতকের স্থাপনা, ১৯৮৩ সালে জেরোনিমোস মনাসটেরির সাথে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত হয়। টিকিট কিনতে হয় ভেতরে ঢোকার জন্য।

**বেলেম টাওয়ার**

বেলেমের সব থেকে বিখ্যাত গন্তব্য টোরি দি বেলি বা বেলেম টাওয়ারে। শীতকালে সকাল ১০টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে আর গ্রীষ্মে সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে প্রদর্শনীর শেষ সময়ের আধঘন্টা আগেই ভিতরে ঢোকা বন্ধ করে দেয়া হয়। বেলেম টাওয়ার ইউনেস্কো স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। একে টাওয়ার অব সেন্ট ভিনসেন্টও বলা হয়। ছোট নদীদ্বীপের উপর দুর্গ আকৃতির এই ওয়াচ টাওয়ারটি দূর থেকে দেখলে মনে হয় জলে যেন ছোট একটা জাহাজ ভাসছে। ১৫১৯ সালে রাজা প্রথম ম্যানুয়েল এটির উদ্বোধন করেন। সেকালে শহরের সুরক্ষার কাজে মিনারটি ব্যবহৃত হতো। টাওয়ারের প্রধান মিনারটি ৩০ মিটার উঁচু। আমরা বাস থেকে নেমে দেখি ভিতরে ঢোকার বিশাল লাইন। এত বড় লাইন দেখে মনটাই দমে গেল। এই লাইন পেরিয়ে সিকিউরিটি চেক করে ভিতরে ঢুকতেই তো ঘন্টাখানেক লেগে যাবে। তবে প্যাট্রিসিয়া আশ্বস্ত করল যে, আমাদের টিকিট প্রি বুক করা আছে, তাই আমাদের লাইনে দাঁড়াতে হবে না, আমরা সরাসরিই ঢুকতে পারব।

যাক একটু আশ্বস্ত হলাম। বেলেম টাওয়ার এবং জেরোনিমোস মঠ উভয়ের জন্য একটি টিকিট প্যাকেজ €12-তে ক্রয় করা যায়, তবে শুধু মঠের জন্য টিকেট ৫ ইউরো আর গির্জায় প্রবেশের জন্য কোন টিকেট লাগে না। টাওয়ারে উঠার আগে একটা ড্র ব্রিজ পার হতে হয়, নিচেই একটা বেশ গভীর পরিখা। বোঝাই যাচ্ছে একসময় এই টাওয়ারকে সুরক্ষিত রাখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হতো। এই ধরনের ড্র-ব্রিজ এর আগেও মধ্যযুগীয় বেশ কয়েকটি ক্যাসেল বা দুর্গে দেখেছি। এই টাওয়ার এক সময় নিরপত্তার দায়িত্বে ব্যবহার হলেও পরবর্তীতে সময়ের পরিক্রমায় এটি তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে ব্যাবহৃত হতে থাকে কাস্টম হাউস, প্রিজন, টেলিগ্রাফ হাউস এমনকি বাতিঘর হিসেবেও। আর আজ এটা নিছকই একটা ট্যুরিস্ট আকর্ষণ। তবে এখনো এর ভিতরে সেই আমলে ব্যাবহৃত বেশ কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম রয়ে গেছে। সচেতন থাকুন যে টাওয়ারের উপরে এবং মধ্যবর্তী মেঝেতে অ্যাক্সেস, খুব সংকীর্ণ, খাড়া সর্পিল সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। উঠা এবং নামার জন্য একই সিঁড়ি ব্যবহার করা হয় এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য লাল রঙের একটা লাইট রয়েছে; যা অনবরত সিগন্যাল দিতে থাকে। শুধুমাত্র টাওয়ারের জন্য এন্ট্রি ফি €5।

বেলেম টাওয়ার মূলত একটি দুর্গ যেটি তাগুস নদীর প্রবেশমুখকে সুরক্ষিত করবার জন্যে এবং লিসবনের আনুষ্ঠানিক প্রবেশদ্বার হিসাবে ১৬শ শতকে তৈরি করা হয়। পর্তুগিজ এইজ অব ডিসকভারির সময় এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য একে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি যদিও এখন তাগুস নদীর পারে অবস্থিত; তবে বলা হয় নির্মাণের সময় এটি তাগুস নদীর মাঝে একটি ছোট্ট দ্বীপের উপর নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৭৫৫ সালের ভূমিকম্পে তাগুস নদী দিক পরিবর্তন করায় এর অবস্থান হয়ে যায় নদীর পাড়ে। সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরের টেরেসে উঠে এলাম। এখান থেকে তাগুস নদীর দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। এখান থেকেও এপ্রিল ২৪ নামের ব্রিজটি দেখা যাচ্ছিল। এক পাশে একটা আর্মি ব্যারাকের মতো আছে। খানিকটা দূরে কমব্যাটান্ট মিউজিয়াম। ১৭ শতকের এক দুর্গে গড়ে উঠেছে সমরাস্ত্র সংগ্রহশালা। এখান থেকে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম রাজা ম্যানুয়েল-১ এর ডানজেন বা ভূগর্ভস্থ কারাপ্রকোষ্ঠে, যেটাকে রাজদ্রোহীদের আটক এবং অত্যাচার করবার কাজে ব্যবহার করা হতো। টাওয়ারের উপর থেকে আশপাশের দৃশ্য খুব হৃদয়গ্রাহী হলেও এই ডানজনে ঢুকেই মনটা বিষিয়ে উঠলো, না জানি কত নিরপরাধের রক্ত মিশে আছে এর দেয়ালে, কত নিরপরাধের করুণ অশ্রুর নীরব সাক্ষী এই নিষ্ঠুর দেয়াল।

এখানে আর বেশিক্ষণ মন টিকলো না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেই অর্থে এই টাওয়ারের বড় কোনো সংরক্ষণ ও পুন:র্নির্মাণ কাজ করা হয়নি। ১৯৮৩ সালে টাওয়ারে একটি উল্লেখযোগ্য ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, ফলে ওই বছরই ইউনেস্কো এই টাওয়ারকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করে। ১৯৮৮ সালের প্রথমদিকে এক বছরব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী পুনঃর্নির্মাণ কাজ করার পর বেলেম টাওয়ার আজকের রূপে দেখা দেয়। ২০০৭ সালে "পর্তুগালের সাতটি বিস্ময়ের" মধ্যে একটি হিসাবে এ টাওয়ারকে ঘোষণা করা হয়।

**‘পন্তে ২৫ দে আব্রিল’**

বেলেম টাওয়ার থেকে বেরিয়ে নদীপাড়ের শানবাঁধানো পেভমেন্টে কিছুক্ষণ বসে বসে উপভোগ করছিলাম টাগুস নদীর সৌন্দর্যকে। টাওয়ারের পাশেই একটা টু সিটার প্লেন স্থাপন করা আছে। প্যাট্রিসিয়া জানালো এই প্লেনে করেই প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন দুই নাবিক, তাদের সন্মানার্থেই এই প্লেনটিকে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে দেখা যায় ‘পন্তে ২৫ দে আব্রিল’ সেতু, যার নাম জড়িয়ে আছে ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল হওয়া পর্তুগিজ রেভল্যুশনের সাথে। ব্রিজটি অনেকটা ইউএসএর সানফ্রান্সিসকোর ‘গোল্ডেন গেইট’ ব্রিজের মতো দেখতে। গোল্ডেন গেট ব্রিজ যে ইঞ্জিনিয়ারিং হাউসের তত্ত্বাবধানে তৈরি এই ব্রিজটিও সেই একই ইঞ্জিনিয়ারিং হাউসের তত্ত্বাবধানে তৈরি। তাই দুই ব্রিজের মাঝে এত মিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে নদীর ওপারে অবস্থিত ‘ক্রাইস্ট দ্য কিং’ মূর্তিটিও ব্রাজিলের ‘ক্রাইস্ট দ্য রিডিমারের’ আদলে তৈরি। যাক এক সুযোগে লিসবন, রিও ডি জেনিরো আর সান ফ্রান্সিস্কো সবার স্বাদই নেওয়া হয়ে গেল।

**ডিসকভারি মনুমেন্ট**

এখান থেকে উঠে খানিকটা হেটেই পৌছে গেলাম একটা হারবারের মতো জায়গায়। চারপাশে নানা আকৃতির ইয়ট আর বোট। তার মধ্যে ফিশিং বোট থেকে শুরু করে প্রমোদতরী, জেট স্কী সবই আছে। সামনে যে বিশাল স্তম্ভের মতো মনুমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে সেটার নাম পাড্রাও দেস কম্ব্রিমেন্তস’ বা ডিসকভারি মনুমেন্ট- ১৫শ এবং ১৬শ শতকের পর্তুগিজ আবিষ্কারকে স্মরণ করার মনুমেন্ট। জাহাজের মাস্তুলে সারিবদ্ধ নাবিকরা। সাদা রঙের মনুমেন্টটির দু-পাশেই মূর্তি- সর্বমোট ৩৩ জন সমুদ্র পথযাত্রীর। সবার সামনে পর্তুগালের ন্যাভিগেশন জগতের ফাদার হেনরি দ্য নেভিগেটরের মূর্তি। বাদ যায়নি ভাস্কো দা গামাও। এলাচদারুচিনি আর রকমারি মসলার সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে কত বণিকের আগমন। তারই পথ ধরে ১৪৯৭ সালে পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল-১ ভাস্কো দা গামাকে নতুন পানি পথের সন্ধানে পাঠালেন।

লিসবন থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকার কেইপ অব হোপ, মোজাম্বিক আর কেনিয়ার মোম্বাসা মালিন্দি হয়ে ১৪৯৮ সালের ২০ মে পৌঁছলেন ভারতের ক্যালিকাট উপকূলে। খুলে গেলো ইউরোপ থেকে সমূদ্র পথে এশিয়ায় বাণিজ্যের দুয়ার। ১৭১ ফুট উচ্চতার ভাস্কর্যটি মনে করিয়ে দেয় পর্তুগিজ নাবিকদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। এর ঠিক নিচেই একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ আঁকা আর তার সাথে সেক্সট্যান্ট যন্ত্রসহ আরো কিছু যন্ত্র স্থাপন করা আছে নেভিগেশনে পর্তুগালের সোনালি অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই। এই উইন্ডর্স দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পর্তুগালকে উপহার দেয়া হয়েছিল হেনরি দ্য নেভিগেটরের ৫০০ তম মৃত্যুবার্ষিকিকে স্মরণীয় করে রাখতে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তামাশা অন্তরীপ বা কেপ অফ গুড হোপ আবিস্কার করেছিলেন হেনরি দ্য নেভিগেটর। এই তাগুস নদী থেকেই ১৫শ-১৬শ শতকে ইন্ডিয়া ও প্রাচ্যে যাবার বাণিজ্যপথ খুঁজে বের করবার জন্যে জাহাজ ছেড়ে যেত, ইতিহাসে যা পর্তুগিজ এইজ অব ডিসকভারি নামে পরিচিত। আর এই পর্তুগিজ এইজ অব ডিসকভারির স্মৃতিতেই মনুমেন্ট অফ দ্য ডিস্কভারিস তৈরি করা হয়। মজার ব্যাপার এটা দুইবার নির্মাণ করা হয়, একবার অস্থায়ীভাবে ১৯৪০ সালে। যেটা ১৯৪৩ সালে ভেঙ্গে ফেলা হয়, এরপর আবার ১৯৬০ সালে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হয়, যেটা আমরা দেখলাম। এই সৌধের শীর্ষে ওঠা যায় প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে। সেখান থেকে নদী, বেলেম অঞ্চল, সৌধ লাগোয়া চত্বরে খোদিত পৃথিবীর মানচিত্র দেখতে ভালো লাগে। এই একই প্রাঙ্গণে বিশাল বিশাল অক্ষরে লাভ লেখা আছে আর তার তার জালির গায়ে হাজার হাজার তালা ঝুলছে। এই তামাশা এর আগেও বিভিন্ন সিটিতে দেখেছি। লাভকে তালা লাগানোর এই তামাশা আমার মাথায় ঢোকে না।

**জেরোনিমোস মনেস্ট্রি**

বেলেম টাওয়ার আর ডিসকোভারি মনুমেন্ট দেখা শেষ হতেই আবার বাসে চড়ে রাস্তার অপর পিঠে চলে এলাম। সামান্য একটু রাস্তা, হেঁটেই আসা যেত। বাস থেকে নামতেই দলনেতা জানিয়ে দিলন এখানে মোট সময় ১ ঘণ্টা। ঠিক ১ ঘণ্টা পর বাস নির্দিষ্ট জায়গায় ৫ মিনিটের জন্য থামবে, কেউ মিস করলে ট্যাক্সি ধরে হোটেলে চলে যেতে হবে। বাস থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম সাদা রঙের একটা অপুর্ব স্থাপনাকে। কিন্তু বাস থেকে নেমে একটু সামনে এগুতেই ভুল ভাঙল, যেটা আসলে জেরোনিমোস মনেস্ট্রি মনে করেছিলাম আদতে তা সেই মনেস্ট্রিরই একটা পিভিসিতে ছাপানো সমান আকৃতির কাটআউট। আসলে এই মুহুর্তে জেরোনিমোস মনেস্ট্রির সংস্কার কাজ চলছে, তাই এই অভিনব ব্যবস্থা। সামনে এগিয়ে গেলাম। সাদা পাথরের ১৬শ শতকের বিশাল স্থাপনা। অদূরে তাগুস নদী। নির্মাণশৈলী যেমন সুন্দর তেমনি টেকসই। ১৭৭৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে লিসবনের বেশিরভাগ ভবন যেখানে ধসে পড়েছিল সেখানে জেরোনিমোসের তেমন কোনো ক্ষতিই হয়নি।

এটি প্রথমে শুরু করা হয়েছিল সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসার পর কোয়ারেন্টিন সেন্টার হিসেবে। নাবিকরা সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরলে এখানে কিছু দিন কাটিয়ে তবেই মূল শহরে ঢুকতে পারতেন। এই ব্যবস্থার কারণ ছিল বাইরে থেকে বয়ে আনা রোগ জীবাণু যেন শহরের ভিতর ঢুকতে না পারে। আজও এ ব্যবস্থা কতটাই না উপকারী। আজকের এই কোভিড মহামারীর সময়ে এ ব্যবস্থার উপযোগিতা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। জেরোনিমাস মনেস্ট্রি, সন্ত জেরোমের নামে সাদা ম্যানুয়েলীয় স্থাপত্যের শিল্পসুষমামণ্ডিত চার্চ। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রথম ম্যানুয়েলই এর প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এ চার্চের অন্য ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে। এটাও জড়িয়ে আছে ভাস্কো দা গামার ইতিহাসের সাথে। কথিত আছে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা তার ভারত সমুদ্র যাত্রার আগের রাতটি কাটিয়ে ছিলেন এখানেই। ১৯৮৩ সালে এই সৌধ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

জেরোনিমোস মনেস্ট্রি নির্মাণ সম্পন্ন হয় ১৫০২ সালে। এই মনেস্ট্রিতেই আছে পর্তুগিজদের জাতীয় পুরাতত্ত্ব ও জাতিবিদ্যা জাদুঘর, যেগুলোকে এক কথায় বলা যেতে পারে প্রাগৈতিহাসিক ও রোমান সংগ্রহশালা। আশ্রমের সম্মুখে অভিজাত বাগান। পর্তুগিজদের সঙ্গে সমুদ্র অভিযান প্রায় সমার্থক। এ আশ্রম পর্তুগালের অভিযান যুগের সাক্ষী। এ স্থানটি ইতিহাসে আরও বৃহৎ তাৎপর্য বহন করে, কারণ এখানে সমাহিত আছেন ভাস্কো-দা-গামা অর্থাৎ এখানেই গামার সমাধিস্থল।

গামা একজন পর্তুগিজ অনুসন্ধানকারী, সেই সঙ্গে পর্যটক; ইউরোপ থেকে যে ব্যক্তি প্রথম পানিপথে এশিয়া এসেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৪৯৭ সালে। তিনি কেবল এশিয়া আর ইউরোপকে সংযুক্ত করেননি, ভ্রমণ শুরু করেছিলেন আটলান্টিক মহাসাগর থেকে থেমেছেন ভারত মহাসাগরে গিয়ে। এশিয়ায় পর্তুগিজদের সুদীর্ঘ উপনিবেশ স্থাপনের পথ সৃষ্টি হয়েছিল এ অভিযানের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞরা মনে করেন এ অভিযান বিশ্বায়নের বহু সাংস্কৃতিক ধারণার প্রচলন করেছে।

চার্চের একাংশে এখন মিউজিয়াম। টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। সামনে তাকিয়ে দেখি বিশাল লাইন। আজ বন্ধের দিন হওয়ায় এ দশা। এখন লাইনে দাঁড়ালে নির্ঘাত দুই ঘণ্টা লেগে যাবে। তাই আর সেদিকে পা বাড়ালাম না। তবে চার্চের মূল অংশে পর্যটকরা অবাধে যেতে পারেন। ঢুকেই বাঁ-দিকে ভাস্কো দা গামার সমাধি। ভারত থেকে আনা তার দেহাবশেষ রাখা হয়েছে এখানে। আর ডানদিকের সমাধিটি পর্তুগিজ কবি ও ইতিহাসবিদ লুই ক্যামোয়েজের। রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যালোকের প্রবেশে চার্চের মধ্যেটা আলোকিত। সুউচ্চ স্তম্ভ আর খিলানের গায়ে বাহারি প্রার্থনা বেদিটিও রঙিন আর পাথরের কারুকাজও অনবদ্য।

পর্তুগিজ ডেলিকেসি ‘পাস্তেল দে নাতার’ উদ্ভব এই মনেস্ট্রিতেই। ডিম ময়দার মিষ্টি জাতীয় খাবারটি আসলেই সুস্বাদু। রাস্তার পাশের দোকান থেকে শুরু করে নামকরা রেস্তোরাঁ সবখানেই এর সহজলভ্যতা। আর ইতিহাসটাও মজার। ১৮শ শতকের কিছু আগে মনেস্ট্রির মঙ্কদের হাতে খাবারটির উদ্ভব হয়। ক্যাথলিক মঙ্করা ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করত পোশাকের স্টার্চিঙের জন্য। রয়ে যাওয়া ডিমের কুসুম থেকেই উদ্ভব হয় খাবারটির। ব্রাজিল এবং অন্যান্য প্রাক্তন পর্তুগিজ উপনিবেশ দেশগুলোতেও মিষ্টান্নটি বেশ জনপ্রিয়। ইউকের গার্ডিয়ান পত্রিকা এটিকে বিশ্বের ১৫তম সুস্বাদু খাবার হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। কোনো পর্যটকই বোধহয় পাস্তেল দে নাতার স্বাদ গ্রহণ না করে পর্তুগাল ছাড়ে না। আমরাও আর সেই সুযোগ হাতছাড়া করি কীভাবে। ২.৫ ইউরো করে কেনা খাবারে কামড় বসাতেই মনে হলো মিষ্টি মাখনে মুখ লাগিয়েছি। সত্যি অপুর্ব স্বাদ। দেশে ফেরার সময় দুই ডজন নাতা সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু জেরোনিমাস মনেস্ট্রিতে যেই স্বাদ পেয়েছিলাম, তা আর খুঁজে পাইনি। পরের বছর প্রাগে এবং তার পরের বছর স্পেনেও নাতা ট্রাই করেছি, কিন্তু সেই স্বাদ আর পাইনি।

নাতা ট্রাই করার পরও দেখি হাতে বেশ কিছুটা সময়। আমাদের দলের অনেকেই দেখলাম ১৫শ শতকের হেরিটেজ ক্যারিজে চড়ার জন্য লাইন দিয়ে দাড়িয়েছে। মাত্র ৫ ইউরোতে এই ক্যারিজ আপনাকে পুরো মনেস্ট্রি কমপ্লেক্স ঘুরিয়ে দেখাবে। আমার অত উৎসাহ নেই, তবে ক্যারিজের চেয়ে তার সাথে জুড়ে দেয়া এক জোড়া ঘোড়া আমাকে আকর্ষণ করল আরো বেশি। সত্যি বলতে এত উন্নতজাতের ঘোড়া আগে কখনো দেখিনি।

ওখানে আর বেশি সময় না নষ্ট করে হাঁটতে হাঁটতে আরেকটু এগিয়ে ঢুকে পড়লাম একটা মিউজিয়ামে। এটা পর্তুগালের ন্যাশনাল আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম। ঢুকেই থমকে পড়তে হলো। ইতিহাসকে যেন বাক্সবন্দি করে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন কাচের বাক্সে কয়েক হাজার বছরের পুরনো ফসিল থেকে শুরু করে নানা নথিপত্র আর পর্তুগালের ন্যাভিগেশন চর্চার ইতিহাস আর বিভিন্ন ধরনের নৌকার বিবর্তন কী নেই সেখানে। ঘুরে ঘুরে দেখে বেশ ভালোই সময় কাটছিল, কিন্তু বিধি বাম। সঙ্গীর ফোন, বাস চলে এসেছে। অগত্যা কি আর করা আধা ইতিহাস মাথায় গেঁথেই ফিরতি পথে রওনা হলাম।

বেলাও হয়ে গেছে অনেকটা, সবারই কমবেশি ক্ষুধা লেগেছে। প্যাট্রিসিয়া ওকে জানাতেই বাস ঘুরিয়ে লিসবনের আরেক শহরতলির দিকে রওনা হলাম আমরা। একটা বেশ পুরনো মহল্লায় মেইন রোডে বাস রেখে বেশ কিছুটা হেঁটে আমাদের পৌঁছতে হলো এক পর্তুগিজ রেস্তোরাঁয়। আসার পথটা লম্বা হলেও রাস্তার দুই পাশের বাড়িঘরে বিভিন্ন ডিজাইনের গ্রাফিতি আর তাদের উজ্জ্বল রঙ সহজেই মুগ্ধ করল সবাইকে। লাঞ্চের পর কিছুটা সময় রেস্টুরেন্টে বসেই আড্ডা দিলাম। এবার আবার প্যাট্রিসিয়ার তাড়ায় আরেকবার পথে নামলাম। আমাদের এবারের গন্তব্য মিরাদুরো পার্কা এদুয়ার্দো সেভেন, গালভরা একটা নাম।

**মিরাদুরো পার্কা এদুয়ার্দো সেভেন**

প্রায় ২০ মিনিটের একটা বাস রাইডের পর পাট্রিসিয়া আমাদের নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লেন একটা হিলের গোড়ায়। এবার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হবে। খুব একটা কষ্টসাধ্য অবশ্য নয়। অনেকেই হিলের কথা শুনে বাসেই বসে রইলেন। কিন্তু যারা না আসলেন তারা পরে ছবি দেখে আফসোস করেছেন। সত্যি বলতে এই জায়গাটা একটা অসাধারণ জায়গা। বিশেষ করে একটা বিকাল কাটানোর জন্য অসাধারণ একটা প্লেস এই মিরাদুরো পার্কা এদুয়ার্দো সেভেন। এটি আসলে একটা ভিউ পয়েন্ট। পর্তুগিজ ভাষায় মিরাদুরো মানে ভিউ পয়েন্ট। এদুয়ার্দো সেভেনের স্মরণে এই ভিউ পয়েন্ট তৈরি হয় ১৯৪৫ সালে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে চোখ মেলে দিলে দেখতে পাবেন মার্কাস দ্য পাম্বাল স্ট্রিট পেরিয়ে এভেন্ডিদা দ্য লিবার্দাদে; আর কপাল ভালো থাকলে তাগুস নদীর দক্ষিণ পার পার হয়ে হিলস অব আররাবিদা পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যেতে পারে।

আসলেই সামনের দিকে তাকাতেই চোখটা জুড়িয়ে গেল, অদ্ভুত সন্দর এ জায়গায় নিয়ে আসার জন্য প্যাট্রিসিয়াকে আবারো ধন্যবাদ জানালাম। এখানে আরেকটা মনুমেন্ট রয়েছে যেটা ২৫ এপ্রিলের সন্মানে বানানো। কিছুটা সময় এখানে কাটিয়ে আমরা চললাম লিসবন এরেনার পথে।

একসময় বুলফাইট এরেনা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এটি একটি শপিং মল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে দর্শনীর বিনিময়ে এখনো বুল ফাইট উপভোগের সুযোগ রয়েছে। বুল ফাইট আর তার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর আশা রাখি আমার স্পেন ভ্রমণের কথামালায়। এখানে আর খুব বেশি সময় ব্যয় করলাম না। কারণ আমাদের আরও একটি বড় শপিং মলে যাওয়ার প্ল্যান আছে। যেই ভাবা সেই কাজ, আবার প্যাট্রিসিয়ার দেখানো পথে এগিয়ে চলল আমাদের যান।

**স্পোর্টিং লিসবনের হোম গ্রাউন্ড**

আমরা এখন যে শপিং মলের সামনে দাঁড়ানো তার বিপরীতেই জোসে আলবালাদে, বিখ্যাত ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনের হোম গ্রাউন্ড। এই স্টেডিয়ামে একসঙ্গে বসে ৫০ হাজার দর্শক খেলা দেখতে পারেন। ১৯৫৬ সালে স্টেডিয়ামটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি উৎসাহের দরুন আমরা কয়েকজন রাস্তা পেরিয়ে চলে গেলাম স্টেডিয়ামের কাছাকাছি। এখন কোনো খেলা নেই তাই স্টেডিয়াম বন্ধ। আর এই স্টেডিয়ামে ঢুকতে চাইলেও আগে থেকে প্রি-বুক করতে হয়। আমাদের গাইড জানালেন আমরা চাইলে উনি স্টেডিয়ামে ভিসিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তবে বেশির ভাগেরই কোনো উৎসাহ না দেখে আমিও দমে গেলাম। পর্তুগালের সর্বোচ্চ লিগে খেলা স্পোর্টিং লিসবন একটি পেশাদার ফুটবল ক্লাব। বিশ্ব বিখ্যাত ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পেশাদার ক্যারিয়ারের শুরু হয়েছিল এই ক্লাবে। রোনালদোর সাবেক এই ক্লাবটির সমর্থকরা ক্লাবটিকে লিও নামে ডাকে। বাংলায় যার অর্থ হলো সিংহ। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি পর্তুগালের তিনটি বড় ক্লাবের মধ্যে অন্যতম। তারা তাদের ইতিহাসে কখনো পর্তুগালের প্রথম বিভাগ ফুটবল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে অবনমিত হয়নি। এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫২টি শিরোপাজয়ী স্পোর্টিং লিসবন পর্তুগালের ফুটবল ইতিহাসে শিরোপা জয়ের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে; যার মধ্যে একটি ১৯৬৩-৬৪ মৌসুমে উয়েফা কাপ উইনার্স কাপের শিরোপা। তাদের ৫২টি ট্রফির মধ্যে ১৯টি হলো প্রিমিয়ার লিগের ট্রফি। এছাড়া তারা চারবার পর্তুগিজ কাপের ট্রফি, চারবার চ্যাম্পিয়ন অব পর্তুগালের ট্রফি, তিনবার তাকা দি লিগার শিরোপা, আটবার পর্তুগিজ সুপার কাপের শিরোপা জয় করেছে। ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোর র্যাংকিংয়ে স্পোর্টিং লিসবনের অবস্থান ৩২তম। স্টেডিয়ামে যেহেতু ঢোকা গেল না অগত্যা শপিং মলেই সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত হলো। আবারো দলনেতা সময় বেঁধে দিলেন, পাক্কা দুই ঘণ্টা। ঠিক ৮টার সময় সবাইকে পার্কিং লটে উপস্থিত থাকতে হবে অন্যথায় ডিনার মিস। ডিনারের লোভেই হোক আর ট্যাক্সি ভাড়া গোনার ভয়েই হোক যথাসময়েই সবাই হাজির ছিল পার্কিং লটে কেবল দলের দুই নারী সদস্য ছাড়া। অগত্যা তাদের ছেড়েই আমরা এক বাঙালি হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে সোজা হোটেলপানে চললাম।

কালকের প্ল্যানে আছে ভাস্কো দা গামা ব্রিজ পার হয়ে টাগুস নদীর অপর পারের পোর্ট আলতো নামে এক ফ্যাক্টরি আউটলেটে ঘুরে আসার। সেখানে নাকি বিশ্বের তাবত সব নামি-দামি ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায়। এ কথা শুনে দলের নারী সদস্যদের আগ্রহের পারদ কোথায় পৌঁছেছিল তা আর নাই বললাম; তবে আমার মতো দীনহীন ট্যুরিস্টের কাছে এখনো এসব ফ্যাক্টরি আউটলেট স্বপ্নের মতোই।